সিলভিয়া প্লাথের *এরিয়েল* : অস্তিত্বযুদ্ধের শিল্পায়ুধ

তারানা নুপুর*

[**সারসংক্ষেপ:** সিলভিয়া প্লাথ ক্ষণজন্মা প্রতিভাবান এক পশ্চিমা-কবি। আত্মহত্যার অব্যবহিত আগে লেখা এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর *এরিয়েল* (১৯৬৫) কাব্যটি বিশ্বসেরা কাব্যগ্রন্থগুলোর একটি বলে স্বীকৃত। মৃত্যুর প্রায় দুই দশক পর ১৯৮২ সালে *এরিয়েল* কাব্যের জন্য তিনি 'পুলিৎজার' পুরস্কারে ভূষিত হন। সিলভিয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর এই কাব্যটি তাঁর জীবনীকারদের জিজ্ঞাসু করে তোলে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অনেক অজানা ঘটনা ও অনুভূতির প্রতি— নারীবাদী লেখক ও শিল্পীদের নানা তির্যক মন্তব্য ও অভিযোগের লক্ষ্যবিন্দু হন টেড হিউজ (১৯৩০-১৯৯৮)। কারণ, স্বামী টেড হিউজের সাথে বিচ্ছেদ-পরবর্তী জীবনে তাঁর অস্তিত্বের নানা সংকটের স্বীকারোক্তির আভাস ছিল এই কাব্যে, যদিও কাব্যটি সিলভিয়ার অন্তর্ধর্মে এবং শিল্পসাধনায় অনবদ্য। সিলভিয়া সম্পর্কিত সকল জল্পনার ঊর্ধ্বে তাঁর এই বিশেষ কাব্যটির নির্মোহ বিশ্লেষণই এ আলোচনার অন্বিষ্ট।]

সিলভিয়া প্লাথ (১৯৩২-১৯৬৩) বিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধের একজন মার্কিন কবি। সিলভিয়া প্লাথের নামোচ্চারণের সাথে-সাথে সাধারণ পাঠক-সমালোচকের মনে জেগে ওঠে তাঁর আত্মহননের বিষয়টি। তাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যত চর্চিত, তাঁর কাব্য ততটাই উপেক্ষিত। একথা সত্য যে, তিনি 'কনফেশনাল' কবিতা লিখেছেন এবং এই ধারার কবি রবার্ট লাওয়েল (১৯১৭-১৯৭৭), অ্যান সেক্সটন (১৯২৮-১৯৭৪) প্রমুখের কবিতা তিনি পড়েছেন, তাঁদের সাথে ব্যক্তিগত সখ্য ছিল তাঁর এবং তাঁদের প্রভাবও পড়েছে তাঁর কবিতায়; কিন্তু এও ধ্রুব যে মিথ, প্রতীক, চেতন-অবচেতন, দৃশ্য ও শ্রুতির অধ্যাসে, অন্তর্নাটকীয়তায় একটি মুখচ্ছদের অন্তরালে নিজের জীবনকে বাঁধতে যে একেশ্বরী-সাধনা তিনি করেছেন তা একান্তই সিলভিয়াসুলভ। আত্মহত্যা তাঁর জীবনের অন্তিম কথা; কিন্তু শেষ কাব্য *এরিয়েলের* কবিতাগুলো জীবনের সমস্ত প্রতিকূলতাকে রুখে দেওয়ার যে দুর্মর শপথে গাঁথা তার সাথে আত্মহত্যার নিত্য বসবাস নিশ্চয়ই ছিল না। সিলভিয়ার *দ্য কলোসাস অ্যান্ড আদার পোয়েমস* (১৯৬২), *ক্রসিং দ্য ওয়াটার* (১৯৭১), *উইন্টার ট্রিস* (১৯৭১) এবং *এরিয়েল*— এই চারটি কাব্যের[১] মধ্যে শেষ কাব্যটি এ আলোচনার জন্য নির্বাচনের কারণ, সিলভিয়ার ক্রমরূপান্তরিত ব্যক্তিসত্তা এবং কবিসত্তার উৎকর্ষে এর স্থান। তাঁর প্রবর্তনার প্রলয় সাক্ষ্য এই কাব্য— তাঁর উষ্ণ বিষ-নিঃশ্বাসে এর আবেগের তার বাঁধা; তাঁর অস্তিত্বযুদ্ধের আয়ুধ এর কথামালা, আর যত প্রহরণ তা এর শব্দধ্বনি। এক দুর্মর প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থের অবলম্বন যেন *এরিয়েলের* কবিতাগুলো। সিলভিয়ার কবিতার স্বীকারোক্তি স্বভাবের পাশাপাশি তাঁর কবিতা যে স্বীকারোক্তিসর্বস্ব নয় তা দৃষ্টিগোচর করাই এ আলোচনার উদ্দিষ্ট।

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

https://doi.org/10.62328/sp.v57i1-2.1

এরিয়েল কাব্যগ্রন্থটি ফেবার অ্যান্ড ফেবার প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। এ কাব্যের চল্লিশটি কবিতার মধ্যে প্রায় সবগুলোই ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে সিলভিয়ার প্রয়াণ দিবস ১৯৬৩ সালের ফেব্রুয়ারির ১১ তারিখের মধ্যে লেখা। অক্টোবরেই তিনি লিখেছেন সর্বসাকুল্যে ২৬টি কবিতা। অক্টোবরের ১৬ তারিখে ১০১ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে সিলভিয়া বিপুল উদ্যমে তাঁর মাকে লিখেছিলেন— 'আমি একজন লেখক। এক সহজাত প্রতিভার লেখক। সেটা আছে আমার নিজের মধ্যে। আমি আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো কবিতাগুলো লিখছি এখন। এগুলো আমার নাম উজ্জ্বল করবে' (Sylvia, 1992: 468)। সিলভিয়া প্লাথ মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে ১৯৬৩ সালে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পর প্রাক্তন স্বামী টেড হিউজের সম্পাদনায় ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত তাঁর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ *এরিয়েল* তাঁকে সত্যিই বিশ্বসেরা কবিদের তালিকায় নিয়ে আসে। ১৯৮২ সালে তিনি 'পুলিৎজার' পুরস্কারে ভূষিত হন। "ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণাত্মক" এই কৈফিয়তে টেড হিউজ *এরিয়েলের* ১২টি কবিতা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেননি, যেগুলো মৃত্যুর সপ্তাহখানেক আগে লেখা এবং ব্যক্তিগত বেদনা ও ক্ষোভের চিহ্নবাহী।

২.

অস্ট্রেলীয় বংশোদ্ভূত জার্মান নাগরিক অরেলিয়া স্কবার প্লাথের গর্ভে এবং জার্মান বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক ওট্টো এমিল প্লাথের ঔরসে ১৯৩২ সালের অক্টোবরের ২৭ তারিখে জন্ম হয় সিলভিয়া প্লাথের। সিলভিয়ার বাবা ছিলেন আমেরিকার বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ও কীটতত্ত্ববিশারদ— বিশেষভাবে মৌমাছি গবেষক। সিলভিয়ার জীবনে ও কবিতায় মৌমাছিপ্রীতির প্রবর্তনা এখান থেকেই আসে। বাবার সাথে সিলভিয়ার সম্পর্কের অমিয়-গরল প্রকাশ পায় তাঁর জনপ্রিয় কবিতা 'ড্যাডি'তে। স্মিথ কলেজ এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হওয়া সিলভিয়া ১৯৫৬ সালের জুনে উদীয়মান এক কবি, টেড হিউজের সাথে প্রেমের পরিণতিরূপে সংসার পাতেন এই তৃপ্তিতে যে, পৃথিবীর একমাত্র মানুষ টেড, যার সাথে তাঁর জুড়ি মেলে। বিয়ের পর স্মিথ কলেজেই পড়াতে শুরু করেন সিলভিয়া। লিখতে শুরু করেন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ— যখন যেটা পারেন। সংসারের কাজের ফাঁকে, স্বামী টেডকে লেখায় উৎসাহিত করে অবসরে ডায়রিতে পাতার পর পাতা জুড়ে চলে কেবল তাঁর আত্মচারণ, বিশ্লেষণ, খোঁড়াখুঁড়ি। লেখার ভাবগুলো যেন তাঁর সেই সময়ে নিজের সাথে বোঝাবুঝি থেকেই জন্ম নেয়। মাঝে মাঝে দমে যান। মনে হয় আর লিখতে পারেন না কেন তিনি? আর লিখতে পারবেন তো?— এমন কত কী! আত্মবিশ্বাসটাকে তবু উবে যেতে দেন না। ১৯৬০-এর এপ্রিলে সিলভিয়া প্রথম সন্তান ফ্রেইডা রেবেকাকে জন্ম দেন বোস্টনের বাড়িতে। সে বছরই সদ্য প্রসূতি চুক্তিবদ্ধ হন প্রথম কাব্য *কলোসাস এবং অন্যান্য কবিতা* প্রকাশের জন্য। ১৯৬১-তে গুরুতর

অ্যাপেনডিক্স অপারেশন শেষে বিছানায় শুয়েই লেখেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'টিউলিপ', যা পরে *এরিয়েলের* অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬২ সালের জানুয়ারিতে সিলভিয়া জন্ম দেন পুত্র নিকোলাসকে। ১৯৬২ সালের মে মাসে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্য। আগস্ট মাসে এক বন্ধুপত্নী আসিয়া গুটম্যানের সাথে টেডের গোপন প্রণয়ের কথা জানতে পারেন সিলভিয়া। সেপ্টেম্বর থেকে ভাঙন শুরু হয় হিউজ দম্পতির মধ্যে। টেড হিউজের অন্য নারীর প্রতি প্রণয়াসক্তি সিলভিয়াকে দারুণভাবে অপমানিত করে। হিউজের সাথে সম্পর্কাবসানের সিদ্ধান্ত নেন সিলভিয়া। আগস্টেই সিলভিয়া ও টেড বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে তালাক কার্যকর হয়, অক্টোবরে চলে যান টেড, সিলভিয়াও বাড়ি ভাড়া করেন লন্ডনে। ইংল্যান্ডের কোর্ট সিলভিয়াকে তাঁর পুত্র-কন্যাদের কাছে রাখার সুযোগ দেয়, কিন্তু বিমর্ষ ও নিঃসঙ্গ প্রবাসে একা সন্তান প্রতিপালন সহজ ছিল না তাঁর জন্য। টেড হিউজ খোরপোষ দিয়ে আর সপ্তাহে একদিন বাচ্চাদের সময় দিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। ইংল্যান্ডের খোরপোষ আইনও সিলভিয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ছিল না। সে আইন অনুযায়ী স্ত্রী তাঁর স্বামীর আয়ের এক তৃতীয়াংশ পাবে এবং স্ত্রী যদি আয় করে, তবে তা স্বামীর খোরপোষের সাথে সমন্বিত হবে (Sylvia, 1992: 460)। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬২র একটি পত্রে সিলভিয়া লেখেন, বিচ্ছেদের পর সিলভিয়া এবং টেড দুজন মিলে সাত হাজার পাউন্ড আয় করতেন, সিলভিয়ার আয় ছিল মোট উপার্জনের এক তৃতীয়াংশ। ফলে, উপার্জন করার দণ্ডস্বরূপ সিলভিয়া খোরপোষ পাননি বললেই চলে। এ অমানবিক আইনে সিলভিয়ার কপর্দকশূন্য হবার উপক্রম হয়। টেডের কাছ থেকে বাৎসরিক এক হাজার পাউন্ড খোরপোষ পাওয়া যেত, যার সম্পূর্ণই তাঁর সন্তানদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের জন্য। টেডের জীবনবীমাও সিলভিয়াকে বাদ দিয়েই করা হয়। (Sylvia, 1992: 463) ১৯৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় সিলভিয়ার প্রথম উপন্যাস— *দ্য বেল জার* (১৯৬৩)। উপন্যাসটি অর্ধআত্মজৈবনিক, যা সিলভিয়ার কৈশোর ও যৌবনের আদলে রচিত। দ্বিতীয় একটি উপন্যাসের খসড়া তিনি করেছিলেন, যেখানে টেডের সাথে তাঁর মধুর দিনগুলোর স্মৃতির স্বাক্ষর ছিল। হিউজের প্রতারণার আকস্মিক আঘাতে ক্ষুব্ধ, খণ্ডিতা সিলভিয়া পাণ্ডুলিপিটি পুড়িয়ে ফেলেন। ১৯৬৩ সালের ১০ এপ্রিল রাতে উপর্যুপরি ঘুমের ঔষধ সেবন এবং চুলার গ্যাসের প্রভাবে সিলভিয়া নিজেই নিজের মৃত্যু সাজান। পরের দিন ১১ এপ্রিল সকালে হাসপাতালে নেয়া হলে ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। জানা যায়, তিনি মৃত্যুর পূর্বে ডাক্তারকে ডাকতে বলে একটি চিরকুট লিখে গিয়েছিলেন।

টেড হিউজের চলে যাওয়া সিলভিয়ার জীবনে নতুন অধ্যায় আনে। সিলভিয়ার সুযোগ হয় তাঁর নিজের সক্ষমতাকে আবিষ্কারের। সিলভিয়া পূর্ণভাবে তাঁর আমিত্বে অধিষ্ঠিত হন। নিজেই হয়ে ওঠেন দ্রুতগামী এক এরিয়েল ঘোড়া। পিঠের উপর শক্ত করে বেঁধে নেন জিন, ক্ষুরগুলোতে তোলেন তান। তারপর জীবন-জয়ের এক রেসে নামেন। ৯ অক্টোবর একটি চিঠিতে সিলভিয়া তাঁর মাকে বলছেন— 'আমি তালাক

পেয়েছি। সেটাই বড় কথা... আমি শুধু বলব, এই মুহূর্ত থেকে আমেরিকা আমার জন্য দূরের। ইংল্যান্ডে আমি আমার নতুন জীবন সাজাতে চাই। আমি এখন চলতে শুরু করলে আর থামব না। সারা জীবন শুধু টেডের কথা শুনে এসেছি, তাঁর সাফল্য, তাঁর কীর্তি... যত দ্রুত সম্ভব আমি আমার মতো করে জীবন গড়ব... মাংস খসে পড়ছে যেন আমার হাড়ের থেকে। কিন্তু আমি একজন যোদ্ধা... বেশ ভালোই জানি আমি কী চাই।' (Sylvia, 1992: 465) স্বামীর সাথে বিচ্ছেদের প্রথম মাসেই সিলভিয়া সবচেয়ে বেশি কবিতা লিখেছেন। দুই সন্তান নিয়ে প্রবাসে নানা প্রতিকূলতায় জীবিকা ও জীবনযাপনে তিনি ছিলেন দিশেহারা। গাভীর মতো মাতৃত্ব যাপন করতে হতো তাঁকে। আমেরিকায় ফেরারও কোনো ইচ্ছে ছিল না তাঁর। সিলভিয়ার সংবৎসরব্যাপী সংস্কৃতিক্ষুধার নিবৃত্তি হয় ইংল্যান্ডের উদার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। বিনামূল্যে বাচ্চাদের স্কুল, মনের মতো ডাক্তার আর বিবিসির সাথে একান্ত সখ্য তাঁকে উজ্জীবিত করে। বিবিসির নিয়মিত সাহিত্য-সমালোচনার আয়োজন থেকে পাওয়া চেক এবং বিবিসির উদ্যোগে ছাপা তাঁর কবিতা ও উপন্যাসগুলো তাঁকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। হিউজ তাঁকে ছেড়ে গেলেও মিউজ এসে ভর করে তাঁর উপর। ১২ অক্টোবর আরেকটি চিঠিতে সিলভিয়া তাঁর নতুন প্রেরণার কথা মাকে জানান— 'প্রতিদিন সকালে আমার ঘুমের ঔষধের ঘোর কেটে গেলে আমি ভোর পাঁচটার মধ্যে জেগে যাই, কফি হাতে নিয়ে পড়ার ঘরে চলে যাই। পাগলের মতো লিখছি। সকালের নাস্তার আগেই একটা কবিতা লেখা হয়ে যায়।' (Sylvia, 1992: 466)

৩.

সিলভিয়া প্লাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *দ্য কলোসাসে* তিনি সচেতনভাবে ছিলেন নৈর্ব্যক্তিক। *এরিয়েলে* এসে তাঁর সাথে কবিতার সেই সচেতন দূরত্বটি ঘুচে যায়। কবিতার পর কবিতায় তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি কখনো স্বীকারোক্তির ধরনে, কখনো মিথ-প্রতীকের আশ্রয়ে, কখনো নৈর্ব্যক্তিক বহিরাশ্রয়ে অবমুক্ত করেন। তাঁর জমিয়ে রাখা অনুভূতিগুলো যেন অর্গলমুক্ত হয়ে নতুন উচ্ছ্বাসে, নানা ধারায় প্রবাহিত হয়। ফলে, 'কনফেশনাল' কবিতা রচনা করলেও সিলভিয়ার কবিতা কেবল স্বীকারোক্তিমূলক পঙ্‌ক্তিমালা নয়। নানা ফর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, মূর্ত ও বিমূর্তভাবে সেগুলোর স্বভাব মিশ্র ও জটিল। কখনো সিলভিয়া তাঁর ক্ষোভের তীব্র বঙ্কিম বহিঃপ্রকাশ ঘটান নাটকীয় কোনো ফর্মে— যেমন, একজন আবেদনকারীর কাছে স্ত্রী ফেরি করা এক এজেন্টের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা নিম্নোক্ত কবিতাটিতে—

প্রথমত, আপনিই কি আমাদের নির্ধারিত জন?
আপনি কি পরে আছেন
কোনো পাথুরে চোখ, নকল দাঁত অথবা ক্র্যাচ?
গলাবন্ধনী কিংবা হুক,
রাবারের বুক অথবা উরুসন্ধি,

প্রত্যবয়বের কোনো খুঁত গোপনের প্রয়াস আছে? না, নেই? বেশ
তবে, কীভাবে আমরা আপনাকে কিছু দিতে পারি?
কান্না থামান।
হাত মেলুন।
খালি? খালি। একটা হাত খালি আছে।
ও হাত ভরে দিতে, চায়ের কাপ আনতে এবং মাথা টিপে দিতে
এবং আপনি যা বলবেন তা করতে ইচ্ছুক রবে এটা
আপনি কি এটাকে বিবাহ করবেন?
এটা গ্যারান্টিযুক্ত।

অঙ্গুষ্ঠের ছোঁয়ায় শেষ বেলায় চোখ বুজিয়ে দিতে,
সকল দুঃখ ভুলিয়ে দিতে
... ...
আপনি কি বিবাহ করবেন এটাকে?
চার দেয়ালের মধ্যে এটা জলরোধক, ভাঙনরোধক,
আগুনরোধক, বোমারোধক।
বিশ্বাস করুন আপনাকে আমৃত্যু ধারণ করবে এরা।
... ...
কী মনে হয় এটা দেখে?
শুরুতে সাদা কাগজের মত নগ্ন

কিন্তু পঁচিশ পেরোতেই সে হবে রুপা,
পঞ্চাশে সোনা।
একটা জ্যান্ত পুতুল, যেখানেই তাকাবেন, দেখবেন।
সেলাই করতে পারে, রাঁধতে জানে এটা
কথা কইতে জানে, কথা, কথা।

এটা ভালো কাজ করে, কোনো সমস্যা নেই।
আপনার ক্ষত আছে; এটা নরম প্রলেপ।
আপনার চোখ আছে; এটা হলো ছবি।
বাবা, এটা আপনার শেষ ভরসা।
বিয়ে করবে এটাকে, বিয়ে কর, বিয়ে কর।
(Sylvia, 1965: 4-5)

বস্তুতই স্বভাব অনুযায়ী সিলভিয়ার একেক কবিতায় একেক প্রহরণ ব্যবহৃত হয়েছে (Ames, 1971: 295)। 'জনৈক আবেদনকারী' নামে এই তির্যক কবিতাটিতে দেখানো হয়েছে পুরুষশাসিত সমাজে আর দশটা পণ্যের মতো নারীও কীভাবে ব্যবহৃত হয়। আবেদনকারীকে নিখুঁত জেনে নিয়ে বিক্রেতা তাকে এক স্থাবর সম্পত্তি কিনতে বলেন যা মৃত্যু পর্যন্ত ওই পুরুষের দৈহিক ও মানসিক সব চাহিদা পূরণ করবে। সে পণ্যটি

হল নারী, যে পঁচিশে হবে রূপার মতো মূল্যবান, পঞ্চাশে সোনা— যে পানিরোধী, আগুনরোধী, ভাঙনরোধী এবং বোমারোধী। প্রচণ্ড আয়রনিতে সিলভিয়া এক অভিনব কাঠামোয় কবিতাটি অনলবর্ষী করে লিখেছেন, যেখানে নারীর স্বকীয়তা বিনষ্টে সমাজদৃষ্টিভঙ্গিকে সরাসরি আঘাত করেছেন তিনি। সিলভিয়া নিজে অল্পাধিক এই সমাজ-মনস্তত্ত্বের শিকার হয়েছেন হিউজের সাথে সাত বছরের যাপিত জীবনে। নিজের মাকে দেখেছেন এক স্বৈরাচারী স্বামীর সংসার করতে। স্বামীর মৃত্যুর পর রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে একমাত্র ওভারকোটটি পরে অরেলিয়া প্লাথ কীভাবে সন্তান প্রতিপালন করেছেন তার সাক্ষী সিলভিয়া নিজেই। টেড হিউজের সাথে বিচ্ছেদের পর দুটি সন্তান নিয়ে সিলভিয়ার একাকী যুদ্ধ থেকেই জন্ম নেয় এক অনবদ্য কবিতা 'পরিধি' (Edge)। এটি সিলভিয়ার শেষ কবিতা:

রমণী নিখুঁত।
তার শব

দেহখানি নৈপুণ্যের হাসিতে মোড়ানো,
গ্রিক নেসেসিটির[২] প্রচ্ছায়া যেন

ঢোলা পোশাক তার ঘূর্ণি তোলে বাতাসে,
তার নগ্ন

পদযুগ যেন বলছে ডেকে:
আমরা এখন দুজন বহুদূরে, সব স্থবির।

প্রতিটি মৃত শিশু কুণ্ডলীভূত, একেকটা শুভ্র সাপ,
প্রতি জন তার অনুজ অভিমুখে

দুধের শিশিগুলো, শূন্য এখন।
গুটিয়ে নিয়েছে সে

নিজের দেহের ভেতর আবার পাপড়ির মতো তাদের
গোলাপ কুঁড়ির ভাঁজে, যখন বাগানখানি

হিমে জমা, গন্ধে ঝরে রক্তধারা
নিশি-পুষ্পের মিষ্টি-গভীর গ্রীবাগুলো থেকে।

চাঁদের দুঃখ পাবার কিছু নেই,
অস্থির আড়াল থেকে জ্বলছে সে অমলিন।

এ সব অজানা নেই তার।
তার কালো দহন আর পিছুটান যত।
(Sylvia, 1965: 84)

১৯৬৩ সালের জানুয়ারিতে লেখা সিলভিয়ার শেষ কবিতা 'পরিধি' জটিল, বহুস্তরী কবিতা। এ ঘোর অন্ধকার, ভীতিপ্রদ কবিতাটিতে এক মা গ্রিক পুরাণের মিডিয়ার মতো আত্মহত্যার আগে তার সন্তানদের হত্যা করে। জটিল চিত্রকল্পমালায় গাঁথা কবিতাটিতে বিষাদময় বাৎসল্য ও মৃত্যু নিছক অসহায়ত্ব নয়, বরং প্রত্যেক সামাজিক প্রেক্ষাপটে সত্যের সম্প্রকাশ। প্রচণ্ড শীতের ভেতর দুই সন্তান নিয়ে সিলভিয়ার মানসিক বিপন্নতার ইঙ্গিতও অগ্রাহ্য হয়নি কবিতাটিতে। কুড়ি পঙ্‌ক্তির কবিতাটি দু-লাইন করে জোড় পঙ্‌ক্তিতে বিন্যস্ত, যাকে বলা হয় কপলেট (couplet)। ধ্বনি-অনুপ্রাস ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট ছন্দরীতি নেই। সিলভিয়া ভালোবাসতেন এই রীতিতে লিখতে এবং কবিতায় অনাবশ্যকভাবে অবিচ্ছিন্নতা (enjambment) তৈরি করতে, অর্থাৎ কবিতায় বিরতি ছাড়াই এক পঙ্‌ক্তি থেকে অন্য পঙ্‌ক্তিতে এমনকি অন্য স্তবকে শব্দ-ভাষাকে অন্বিত করতে। যেমন, দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির 'শব' এবং ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির 'নগ্ন' শব্দদুটি যথাক্রমে তৃতীয় ও সপ্তম পঙ্‌ক্তিতে প্রলম্বিত। শেষ স্তবকে সম্পূর্ণ ঘটনায় চাঁদের নিরাসক্ত ভূমিকা আমাদের চমকে দেয়। কবিতায় চাঁদ সাধারণত নারীর প্রতীকে ব্যবহৃত হয়। এ কবিতায় চাঁদ নির্বিকার থাকলেও শেষ পঙ্‌ক্তিতে 'তার কালো দহন আর পিছুটান যত' চাঁদকেও অভিন্ন বাস্তবতার উত্তরাধিকাররূপে চিহ্নিত করে।

চাঁদ সিলভিয়ার কবিতায় প্রায় মিথপ্রতিম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে নির্বিকার, শাদা, বধির। তাঁর কবিতায় চাঁদ যেন এক সন্ত। 'এলম গাছ' (Elm) কবিতায় চাঁদকে দেখা যায় বন্ধ্যা রমণীর মতো মলিন ও পরিত্যক্তরূপে (Sylvia, 1965: 15) । 'চাঁদ এবং ইউ গাছটি' (The Moon & The Yew Tree) কবিতায় গথিক ধাঁচের ইউ গাছের মাথায় চাঁদকে দেখা যায় ভীষণ মনঃক্ষুণ্ন, নীরস ও রুষ্ট এবং যখন মেঘেরা ফুটে ওঠে নীল রহস্যময় হয়ে তারাদের মুখের উপর, তখন গির্জার পাদ্রিরা সব নীল হয়ে যায় আর তাদের পবিত্র-কৃত্যের সমস্ত আয়োজনে চাঁদ হয়ে থাকে নির্বিকার। কবরখানার পাশে ইউ গাছটির নীরবতাও অনিঃশেষ কালোময়তার সংকেত বিলিয়ে যায় (Sylvia, 1965: 41)। একই কবিতায় চাঁদকে তিনি তাঁর 'মা' বলেছেন—

চন্দ্র আমার মাতা। তিনি মেরীর মতন নন মায়াময় ।
নীল আঙরাখা তাঁর মুক্ত করে দেয় অগণিত বাদুড় ও পেঁচকপাঁতি
আমি কেমন করে বিশ্বাস রাখি কবোষ্ণতার প্রতি—
(Sylvia, 1965: 41)

চাঁদের আঙ্‌রাখা থেকে বেরিয়ে আসা বাদুড় আর পেঁচাগুলো যেন কোনো অশুভের ত্রাস সঞ্চার করে এবং সর্বোপরি চাঁদের অনাত্মীয় স্বরূপই প্রকাশ করে। 'এলম গাছ' কবিতায় চাঁদের সাথে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটিও দ্বান্দ্বিক ও রহস্যময়—

চন্দ্রও ক্ষমাহীন: সে আমায় টানে
নিষ্ঠুরভাবে, নিষ্ফলা হতে
তার প্রভা পোড়ায় আমায়। অথবা হয়তো সে আমারই অধীন।
(Sylvia, 1965: 15)

'প্রতিদ্বন্দ্বী' (The Rival) কবিতায় তাঁর দ্বন্দ্বী চাঁদেরই প্রতিরূপ। কারণ, চাঁদের মতোই সে ভালোবাসার নিত্যতার মধ্যে থেকেও অতৃপ্ত, চাঁদের মতোই সে সুন্দরের প্রতিরূপ হয়েও একান্ত বিধ্বংসী— 'চাঁদ হাসলে তা তোমারই উদ্ভাসন হতো/ তুমিও স্বয়ম্প্রকাশ ছিলে/ কোনো সুন্দরের অথচ প্রমায়ুক/ তোমরা দুজনেই আলোর অধমর্ণ/ চাঁদ বিমুখ রয় পৃথিবীর পানে/ তুমি অবিচলিত।' (Sylvia, 1965: 48) যা কিছু বিপ্রতীপ তাই সিলভিয়ার ভালো লাগার বিষয় যেন। বিপ্রতীপতার সাথে বসবাস তাঁর সহজাত স্বভাব। চাঁদের সাথে আকর্ষণ-বিকর্ষণের এই সম্পর্ক একান্তভাবে সিলভীয়। সমালোচক সিলভিয়ার কবিতাগুলোর এই চাঁদকে দেখেছেন 'মিউজ'রূপে এবং চাঁদের পটভূমির সাথে ইটালীয় চিত্রকর জর্জিও দ্যা কিকোরির (১৮৮৮-১৯৭৮) মেটাফিজিকাল চিত্রকর্মের সাদৃশ্য খুঁজে পান (Judith, 1978: 21-22)। প্রাচীন চিত্রকরের প্রভাব বিষয়ে টেড হিউজের মন্তব্যও সমধর্মী। সিলভিয়ার প্রাচীন কবিতা ও শিল্পের প্রতি অনুরক্তির আরো নানা দৃষ্টান্ত আছে *এরিয়েলের* নানা কবিতায়। সুতরাং এ মন্তব্য অমূলক নয়। কিন্তু *এরিয়েলের* নানা কবিতায় চাঁদের এই বিপ্রতীপ এবং বিভ্রমলাগা চিত্রণ সিলভিয়ার কবিতার বিচ্ছিন্ন উপাদান মনে হয় না কখনোই, কারণ কবির ব্যক্তিত্বের নিরাসক্তির সাথে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এভাবেই কবিতায় জন্ম নেয় সিলভিয়ার নিজস্ব মিথ।

৪.

অন্তরের অসহনকে সিলভিয়া তাঁর চারপাশের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অনুষঙ্গের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন, ভ্যানঘগ যেমন একটি সূর্যমুখী কিংবা হেঁশেলের সামান্য একটি চেয়ারকে শিল্পকর্মে রূপান্তরিত করেছেন, তেমনি সিলভিয়াও তাঁর প্রতিদিনের নানা ঘটনা ও অনুষঙ্গকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনুসারী করেছেন (Anne, 1989: 263)। কিন্তু ভ্যানঘগের ছবির ইমপ্রেশন আমাদের যেভাবে ভাব ও রঙের স্নিগ্ধতায় মোহিত করে রাখে, সিলভিয়া কবিতায় তেমনটি নয়। সিলভিয়ার একটি কবিতাও পাওয়া যাবে না, যেখানে প্রসন্নতা বিরাজ করে। প্রকৃতিকে এমনকি তিনি কখনো অতিপ্রাকৃত পর্যায়ে, বাস্তবকে অতিবাস্তবে রূপান্তরিত করে এক ধরনের ত্রাস সঞ্চার করেন। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতায় প্রকৃতি কোনো না কোনো ভয়, সন্তাপ, জুগুপ্সা, জিঘাংসা বা বিষণ্নতায় রূপান্তরিত ও বিকৃত হয় অথচ সে রূপান্তরিত মনোবাস্তবতাকে অস্বীকার করার জো নেই। 'মৌমাছি-মিটিং' কবিতায় যখন বিপন্ন রানি-মাছি হয়ে সিলভিয়া গ্রামবাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন গাঁয়ের সিম-বনের ফাঁকে-ফাঁকে, তখন প্রকৃতির বর্ণনা নিম্নরূপ:

টিনের পাতের একটা টুকরো জ্বলজ্বল করছে জনতার মতো,
সিমফুলের সমুদ্রে পালকের ঝাড়ুগুলো ব্যাজন করছে ধীরে হাত ঘুরিয়ে,
বিষণ্ন-হৃদয় পাতা আর কালো কালো চোখ নিয়ে মাখনরঙা ফুলগুলো
এটা কি দড়ি বেয়ে উঠে যাওয়া আকর্ষীগুলোর শরীরের জমাট রক্ত?
না, না, ওগুলো তো স্কারলেট ফুল; অচিরেই হবে ভক্ষণীয়।
(Sylvia, 1965: 56)

একদিন যে রানিমৌমাছি ছিল আদরণীয়, আজ সে নিষ্প্রয়োজন। তরুণ মৌমাছিদের জীবনচক্রের পথ সুগম করতে রানিমৌমাছিকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। গ্রামবাসীদের ষড়যন্ত্রের শিকার রানিমৌমাছি প্রবল ভয়ে আত্মগোপন করে আছে সিম-ক্ষেতে। সিলভিয়া নিজের ভয় ও অস্তিত্বসংকটকে আরোপ করেছেন ওই রানিমৌমাছির মধ্যে। টিনের পাতের ভেতর জনতার উৎসুক চোখের ভয়, সুন্দর সিমফুলগুলোর হৃদয়ের অপ্রসন্নতা, পালকগুলোর নিরাসক্তি, আকর্ষীগুলোর অসহায়ত্ব আর স্কারলেটের অনিবারণীয় পরিণাম-দৃশ্যের ক্রমরূপান্তরের মধ্য দিয়ে এক বিবিক্ত, ভয়ার্ত, আততায়ী বাস্তবতা চিত্রিত হয়। প্রকৃতির এই দৃশ্যায়ন মোটেও সরল নয়। সিলভিয়ার কবিতায় প্রকৃতি তার প্রকৃত অবয়বে চিত্রিত হয় না। প্রবল সম্প্রকাশ অথবা বিমূর্ত স্বভাবে তা কবিরই মানসলোকের বিচিত্র জটাজালের অনুযাত্রী হয়। তখন কবি আর রানিমৌমাছি কিংবা বিষণ্ন ভোরের মূক প্রান্তরের সাথে কোনো অভেদ থাকে না। 'কুয়াশার ভেড়া' (Sheep in Fog) কবিতার বিষণ্ন প্রান্তর যেন সিলভিয়ারই ম্রিয়মাণ মনের প্রতিচ্ছবি:

পাহাড়গুলো সরে যায় নিঃসীম সাদার ভেতর
মানুষ অথবা নক্ষত্র
বিষাদে সম্ভাষে আমায়, আমি নিরাশ করি তাদের।
নিঃশ্বাসের রেখা ফেলে চলে যায় একটি ট্রেন
কী মন্থর!
মরিচা রঙের ঘোড়াটা
খুরগুলো, বিষণ্ন ঘণ্টাধ্বনি
সারাটা সকাল ধরে
প্রভাত যেন তামসপ্রায়।
একটি ফুল কেবল খসে পড়তে বাকি
অস্থিতে আমার ইস্পাত হিম,
দূরের মাঠখানি দ্রবীভূত যেন হৃদয়ে।

তারা আমায় ভয় দেখায়
কোনো এক স্বর্গের দিকে ঠেলে দেবে বলে
তারাহীন, পিতাহীন এক অন্ধকার জলের ভেতর।
(Sylvia, 1965: 3)

১৯৬২ সালের ২ ডিসেম্বরে নানা অসম্বদ্ধ চিত্রে রচিত এই ব্যাপ্ত-নিঃসঙ্গ প্রান্তরের কবিতাটি সিলভিয়ারই মনের প্রতিকৃতি। সমস্ত কবিতাজুড়ে মন্থরতাকে মন্থন করেছেন কবি। অপসৃয়মাণ পর্বতশ্রেণির প্রেক্ষাপটে এলায়িত পল্লব নিয়ে বৃন্তচ্যুতির অপেক্ষায় যে ফুলটি পড়ে আছে একাকী, সে তো সিলভিয়াই। যে ইস্পাত-কাঠিন্য তাঁর হাড়ে বাজে, তা অসহায়ত্বকে ছাপিয়ে এক নারীর অনমনীয় সংকল্পের আভাস দেয়। দূরের যে মাঠ হৃদয়ে দ্রবীভূত, তা তাঁর দুর্মোচ্য অতীত। শেষ স্তবকে সেই অতীতই বাইরের নানা দৃশ্যকল্পের আভাসে তাঁকে স্মৃতিকাতরতার অন্ধকার স্বর্গে নিমজ্জিত করে। ভুলে থাকার সাধনায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে চায় নক্ষত্রহীন, পিতাহীন, নির্বান্ধব কোনো কালো জলের গভীরে। কবিতাটিতে কালো, সাদা, মরিচা প্রভৃতি রঙের ব্যবহার তাৎপর্যপূর্ণ। পাহাড়গুলোর সাদাময়তার দিকে সরে যাওয়া হয়তো হিউজের চলে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত। কালো বিলয়ের রঙ, মরিচা পরিত্যক্ততার প্রতীক। পুরো কবিতায় কোনো অলস, বিষণ্ন শিল্পী যেন ক্যানভাসের উপর এলোমেলো তুলির আঁচড়ে কিছু বলতে চান, অথচ প্রত্যয় নেই কিছু আঁকার। প্রকৃতির অনুষঙ্গগুলো প্রায়শই তাঁর কবিতায় জান্তব অথবা প্রাণময় রূপ লাভ করে।

৫.

'ড্যাডি' কবিতায় ইলেকট্রা-কমপ্লেক্সতাড়িত এক আত্মজা তার বাবার প্রতিকৃতিকে মনের ভেতর আঁকড়ে থাকে তিরিশ বছর ধরে:

তুমি আর পরো না, আর পরো না
কখনো আর কালো জুতোটা
যার মধ্যে আমি কাটিয়েছি একটা ছোটখাট পায়ের মতো
তিরিশ বছর ধরে; ছোট্ট, শুভ্র
কেবল নিঃশ্বাস নিতে অথবা হাঁচতেই মরিয়া।

বাবা, তোমাকে আমার মেরে ফেলতে হতো
তুমি মরে গেলে, আমি সময় পাবার আগেই —
মার্বেলের মত ভারি, ঈশ্বর-ভরা একটা ব্যাগ
ফ্রিস্কো-সিলের° মতো বড়
ধূসর আঙুল নিয়ে ভীষণ মুরতি তুমি।
... ...
তুমি দাঁড়িয়ে আছ ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে, বাবা
যে ছবি আমার কাছে আছে তোমার,
একটা চিড় তোমার চিবুকে পায়ের বদলে
তা বলে শয়তানের চেয়ে কম নও কিছু
কম নও সেই কালো-মানব থেকে, যে

আমার রক্তিম সুন্দর হৃদয়টাকে কামড়ে দু-ভাগ করেছিল।
আমি তখন দশ, যখন ওরা তোমায় কবর দিল।
বিশে আমি চেয়েছিলাম মরতে
এবং ফিরে যেতে, ফিরে, ফিরে যেতে তোমার কাছে
ভেবেছিলাম, অন্তত হাড়গুলো মিলবে।
... ...
আমি যদি এক জনকে মেরে থাকি, মেরেছি দুজনকে
সে পিশাচ, যে বলেছিল, যে সে তুমিই
এবং আমার রক্ত চুষেছিল একটি বছর ধরে,
আসলে সাত বছর, যদি তুমি জানতে চাও।
... ...
বাবা, বাবা, তুমি একটা বেজন্মা, আমি মুমুক্ষু।
(Sylvia, 1965: 49-51)

সিলভিয়া যেন বড় হননি কোনো দিন। ত্রিশ বছর আগে বাবার মৃত্যু তাঁর কাছে নিজেরই মৃত্যুর সামিল ছিল। সিলভিয়া তাঁর বাবার অস্থিগুলো ফিরে পাবার আশায় আট বছর বয়সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। ব্যর্থ হয়ে কল্পনায় নিজেকে বন্দি করেন মুখবন্ধ কাঁচের জারের ভেতর এক ছোট্ট জাহাজের মধ্যে কিংবা বাবার সেই পুরোনো কালো জুতোটার মধ্যে ত্রিশ বছর ধরে। কালো জুতোটার মিথ তিনি পেয়েছিলেন আফ্রিকার রূপকথা থেকে, আর নিজেকে জারবন্দি করে শৈশবে ফেরার মিথটি তাঁর মস্তিষ্কোদ্ভাবিত, যাকে তিনি অবমুক্ত করেছিলেন ১৯৬২ সালে প্রথম এবং একমাত্র উপন্যাস *দ্য বেল জার* প্রকাশের পর। এত নিবদ্ধতা যে বাবার প্রতি, কবিতায় কেন সিলভিয়া তাকে শত্রু বলে প্রতিপন্ন করেন? এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে বাঁধা ছিল সিলভিয়া ও তাঁর পিতার সম্পর্ক। কিন্তু সে দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত হয় স্বামী টেড হিউজের সাথে সিলভিয়ার বিচ্ছেদের পর। কারণ, ১৯৫৬ সালের পর থেকে সিলভিয়া তাঁর মনের ভেতর বাবার যে মূর্তি গড়ে রেখেছিলেন, তাতে অধিষ্ঠিত করেন তাঁর স্বামীকে। সে কারণেই বিশ্বাসহন্তা টেডের অন্য প্রতিমূর্তি বাবাকে অনায়াসে সিলভিয়া বলতে পারেন — 'বাবা, বাবা, তুমি একটা বেজন্মা'। সে কারণেই তিনি বলতে পারেন, 'আমি যদি এক জনকে মেরে থাকি, মেরেছি দুজনকে' কিংবা 'প্রত্যেক নারীই একজন ফ্যাসিবাদী ভজে'। এ কারণেই সমালোচক অ্যালভারেজ বলেছেন, "সবকিছু সত্ত্বেও 'ড্যাডি' একটি প্রেমের কবিতা" (A. Alvarez, 1970: 66)। প্রেমের সাম্প্রতিক বঞ্চনা ও ক্ষোভ এবং মৃত পিতার প্রতি সকল অভিযোগ সমানুপাতিক হয়ে সিলভিয়ার মনে জমা বুভুক্ষা ও বিতৃষ্ণার গরল এই কবিতাকে উচ্চস্বরিক করে তোলে। সিলভিয়ার মনের এই দুরধিগম্য শারীরিক-মানসিক গঠন তাঁর কবিতাগুলোকে বহুস্তরী এবং অন্তঃস্বভাবী করে তোলে।

সিলভিয়া প্লাথের কবিতার ব্যাসকূট বোধগম্য হয় তাঁর চিঠিপত্র এবং ব্যক্তিগত জার্নালগুলো ঘেঁটে। সিলভিয়া প্লাথের যে জার্নাল টেড হিউজ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর আত্মহত্যার বহু বছর পর প্রকাশ করেন, তা তাঁর দিনলিপির এক তৃতীয়াংশ মাত্র। হিউজ নিজেই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন, কবির মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন দুটো ডায়েরি তাঁর স্বামীর কাছে রক্ষিত ছিল। সিলভিয়ার রোজনামচা দুটির শেষটিতে ছিল তাঁর জীবনের শেষ তিন বছরের কথাগুলো, যেসব তাঁকে এবং তাঁর কবিতার জটিল ও আত্মিক জগৎ বুঝতে সহায়ক হতে পারত সমালোচকদের জন্য। এ শেষ ডায়রিটি হিউজ বিনষ্ট করেন। কারণ, তিনি চাননি তাঁর পুত্র-কন্যা সেগুলো পড়ুক এবং সেই মুহূর্তে তাঁর অস্তিত্ব রক্ষার অনমনীয় প্রয়োজনে বিস্মৃতি আবশ্যক ছিল। এত বছর পর এই জার্নাল প্রকাশের কৈফিয়ত হিসেবে তিনি বলেছেন, যদিও কবিতা আস্বাদনের ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তিগত জীবনে আগ্রহ খুব ভালো কোনো পদ্ধতি বলে মনে করেন না তিনি, তবু সিলভিয়ার কবিতার কৌতূহলী সমালোচক ও গবেষকদের জন্য তাঁর সে সময়ের নিকটতর প্রতিরূপ হবে এই রোজনামচাগুলো— এই বিবেচনায় তিনি তাঁর জার্নালটি প্রকাশ করতে উদ্যোগী হন (Ted, 1985: 152-153)। শেষ দিনগুলোতে মৃত্যু যে সিলভিয়ার একান্ত অভিপ্রায় ছিল না, তা বোঝা যায়, তাঁর স্থানবদল, বিবিসির সাথে নতুন সখ্য, কিছু বন্ধু ও আত্মীয়ের সাথে নতুন সম্পর্ক, টাকা জমিয়ে লন্ডনে নতুন বাড়ি কেনার আগ্রহ, চুলের কাঙ্ক্ষিত নতুন ছাঁট, লাল স্কার্ট-সবুজ সোয়েটারে নিজের বিবর্ণ জীবনকে পুনঃরঞ্জিত করার তীব্র বাসনা প্রকাশে। কবিতার পুনরুদ্দামে না কেবল, পুরোনো জীবনের নির্মোক উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষা তিনি এ সময়ের নানা কবিতায় প্রকাশ করেন। যেমন: 'তিনজন হচ্ছি' কবিতায় মৃত পিতার উদ্দেশ্যে তাঁর নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো:

> এবং আমি ধাবিত হচ্ছি এই খোলস ফেলে
> পুরোনো ব্যান্ডেজের, বিষাদের, পুরোনো মুখশ্রীর
>
> ধাবমান তোমার দিকে লিথির কালো জল ছেড়ে
> অপাপবিদ্ধ হয়ে অপোগণ্ডের মতো।
>
> (Sylvia, 1965: 38)

নরকের দুঃখধারার নদী সাঁতরে নতুন জীবন প্রত্যাশী সিলভিয়া সম্ভবত মৃত্যু ও পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন। হয়তো তাই আত্মহনন তাঁর কাছে এত সহজ। বাবার মৃত্যুর দশ বছর পর তাঁর অস্থিগুলোর সান্নিধ্য অন্তত পেতে যে সিলভিয়া জীবনে প্রথমবার আত্মহননে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তিনি আরো বছর দশেক পেরোতেই আবারও আত্মহননের স্বাদ নিতে চেয়েছিলেন এবং শেষ যে-বার তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন, তার পূর্বেই তিনি লিখে গেলেন এক অভূতপূর্ব কবিতা 'লেডি ল্যাজারাস'। ইংরেজি কবিতায় বাইবেলের কবর-ফেরত বিষাদাক্রান্ত শৈল্পিক চরিত্র ল্যাজারাস আধুনিক কবিতার নতুন প্রসঙ্গ নয় কিন্তু তবু 'লেডি ল্যাজারাস' যেন এক নারীর

জীবন্মৃত জীবনের গরল-কথা— মৃত্যু যেন তাঁর দোসর— মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি সবকিছু পাবার অভীষ্ট প্রকাশ করেন:

আমি এটা আবার করেছি
প্রতি দশ বছরে একবার
আমি করি এটা—

এ এক চলমান বিস্ময়; আমার ত্বক
নাৎসী বাতির ঢাকনার মতো উজ্জ্বল
আমার ডান পা

যেন পেপারওয়েট
মুখচ্ছবি সাধারণ, মসৃণ
ইহুদি লিনেন

রুমালটা হঠিয়ে দাও
ওগো বৈরী আমার
আমি কি ভয় দেখাই? —

এই নাক, চোখের পাতা, দুই দন্তপাঁতি?
এই চুকো ঢেকুর
ঘুচে যাবে এক দিনেই।

অবিলম্বে, খুব শিঘ্রি
এই মাংসভুক কবর
আমার ঘর হবে।

এবং আমি একজন প্রসন্ন রমণী
তিরিশ বছর বয়সী
আর মার্জারীর মতো আমাকেও মরতে হবে নয়বার।

এটা তিন নম্বর
কী এক আক্ষেপ
শটিত প্রতিটি দশক

কত লক্ষ লুতাতন্তু
এই বাদাম-মুড়মুড় ভিড়
ঠেলাঠেলি করে দেখতে আসে

আমাকে হস্ত-পদসহ যেন নগ্ন করে ওরা
সব কিছু খসিয়ে দেবার বিরক্তিকর আয়োজন
ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ

এই তো আমার হাত
এই যে হাঁটু
হতে পারি আমি হাড়মাঁসসর্বস্ব,

অন্যথায় আমি তো সেই একই নারী।
প্রথমবার যখন এটা ঘটেছিল, আমার বয়স ছিল দশ
ওটা ছিল দুর্ঘটনা এক।

দ্বিতীয়বার আমার ইচ্ছে ছিল
চিরবিলয়ের এবং কোনো দিন না ফেরার
আমি বুজে গিয়েছিলাম

একটা সাগর-ঝিনুকের মতো
অনেক ডাকতে হয়েছিল তাদের, অনেক
এবং আমার শরীর থেকে কীটগুলো তুলতে হয়েছিল সেঁটে থাকা মুক্তোর মতো।
আত্মহত্যা
এক শিল্প, অন্য সব শিল্পের মতোই
আমি তা খুব স্বকীয়তার সাথেই করি।
... ...
এক টুকরো সাবান
বিয়ের একটা আংটি
দাঁতের সোনার ফিলিং।

হা রে রে ঈশ্বর, হা রে রে লুসিফার
হও সাবধান
হও সাবধান।
ভস্ম থেকে বেরিয়ে
আমি উঠে আসি রক্তিম এলোকেশী
পুরুষকে গ্রাস করি বাতাসের মতো।

(Sylvia, 1965: 6-9)

সিলভিয়ার *এরিয়েল* কাব্যের অন্যান্য সব বিষয়ের মতো মৃত্যুও একটি অনুষঙ্গমাত্র। তাঁর কবিতা মৃত্যুসর্বস্ব নয়। আর্গো রেকর্ড-কোম্পানির একটি অনুষ্ঠানে 'লেডি ল্যাজারাস' কবিতাটি পাঠের সময় সিলভিয়া এই নারী ল্যাজারাসকে নিজে ব্যাখ্যা করেছিলেন নিম্নরূপে:

> এক জন নারী, যার পুনর্জন্ম লাভের মতো এমন অসাধারণ ও ভয়ংকর একটা বর আছে। শুধু একটা সমস্যা যে, তাকে প্রথমে মরতে হবে। তখন তুমি হবে একটা ফিনিক্স, একটি স্বাধীন আত্মা। একই সাথে সে খুব সাধারণ, ভালো, মেধাবী একজন মহিলাও বটে। (Sylvia, 1978: 119)

ফিনিক্স এক পৌরাণিক পাখি যা পুনর্জন্মের প্রতীক। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী বহু বছর বাঁচার পর মৃত্যুর আগে এ পাখি নিজেই তার চিতা সাজায়, তাতে আগুন ধরায় এবং সেই ভস্ম থেকে জন্ম নেয় নতুন পাখি। জটিল এবং বহুস্তরী এই 'লেডি ল্যাজারাস' কবিতাটিতে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত নারীটি সিলভিয়ার মতোই কোনো রমণী বা কবি বা যে-কোনা সাধারণ নারী, যে মরে গিয়ে সার্বভৌমত্ব অর্জন করে এবং ল্যাজারাসরূপে সে পৃথিবীতে বাস করেও মর্ত্যের বন্ধনছিন্ন এবং সে ক্ষমাহীনভাবে বলতে পারে— 'ভস্ম থেকে বেরিয়ে/ আমি উঠে আসি রক্তিম এলোকেশী/ পুরুষকে গ্রাস করি বাতাসের মতো'। সিলভিয়ার বন্ধু আলভারেজ যথার্থই বলেন, 'তিনি (সিলভিয়া) সকল আধুনিক অপহতের ক্লেশকে ধারণ করেন।' (A. Alvarez, 1970: 64) সহৃদয়-সংবেদকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে মুক্ত হওয়া তো সবকালের কবিদেরই সাধারণ প্রবণতা। সিলভিয়াও তার ব্যতিক্রম নন।

স্বামী টেড হিউজ সিলভিয়াকে উদ্দেশ্য করে 'লাল' নামের একটি কবিতায় বলেছিলেন— 'লাল, তোমার রং ছিল/ লাল না হলে সাদা / কিন্তু লাল ছিল এমন, যাতে মুড়ে থাকতে তুমি/ রক্তলাল, ওটা কি আসলে রক্ত ছিল?' (Ted, 1999: 197)। সিলভিয়া বারবার লালকে পেতে চেয়েছিলেন, হয়তো তাঁর শীতার্ত জীবনকে উষ্ণতা দেবার আকাঙ্ক্ষায়, হয়তো রুগ্ন-নাজুক শরীর নিয়ে হাসপাতালের ফ্যাকাসে শুভ্রতা থেকে জীবনের দিকে ফেরার অরন্তুদ বাসনায়, হয়তো রিক্ত জীবনকে নতুন করে সাজাবার প্রত্যাশায়। কিন্তু, লাল রং তাকে দূর থেকে হাতছানিতে দোলায়, কাছে আসে না। যদিও বা কাছে আসে শুশ্রূষার বদলে তারা যেন শাসায় কবিকে। এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সম্পর্ক তাঁর লালের সাথে। তিনি বার বার লালিমার সান্নিধ্য চান, কিন্তু সে লাল তাঁর সহ্য হয় না। 'জুলাইয়ের পপিগুলো' কবিতায় যন্ত্রণা ভোলার আশায় ছোট্ট পপিগুলোর দিকে তাকিয়েছিলেন কবি পিপাসার্তের মতন—

> ছোট্ট পপির দল, নিরয়শিখাদল,
> তোরা কি করিস না কোনো অনিষ্ট?
>
> মিটমিট করে জ্বলো। আমি ধরতে পারি না।
> হাত রাখি তোদের শিখার উপর ।
> কিছুই পোড়ে না।
>
> এবং আমি ক্লান্ত হই অমন কাঁপতে দেখে তোদের; রেখাময়, তরল লাল,
> ঠিক যেন মুখের ভেতরের মাংস।

এমন মুখ, যা এইমাত্র রক্তাক্ত।
ছোট্ট, ভ্রষ্টা স্কার্টগুলো!

তাতে বাষ্পের উত্তাপ, আমি ধরতে পারি না।
কোথায় তোদের আফিমগুলো, বিবমিষার ঔষধসব?

যদি আমি পারতাম ঘুমাতে অথবা রক্ত ঝরাতে অমন!—
যদি আমার মুখ পারত হতে সাথী অমন ক্ষতের!

অথবা তোদের মদিরা নিতাম তুলে
এই ক্যাপসুল-গ্লাসে,
বিস্বাদিত, বজ্রকঠিন।
অথচ বর্ণহীন। বিবর্ণ।
(Sylvia, 1965: 81)

পনেরো চরণের মুক্ত ছন্দের অন্ত্যমিল-বিরল কবিতাটি ১৯৬২ সালের জুলাইয়ে রচিত। সিলভিয়া তাঁর হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে প্রশমিত করতেই সান্নিধ্য চেয়েছেন দৃশ্যমান রক্তিম পপিগুলোর, ঠিক যেভাবে ওই বছরই শুরুর দিকে ১৮ মার্চ সিলভিয়া হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুশ্রূষা খুঁজেছিলেন টিউলিপের লালিমায়—

টিউলিপগুলো খুব উদ্দীপক, এখানে শীত এখন।
দেখো, কেমন শুভ্র সবকিছু, কেমন শান্ত, তুষার-শীতল।
আমি শিখছি শান্তিময়তা, নিজের পাশে শুয়ে আলগোছে
যেমন বিছিয়ে থাকে আলো সাদা দেয়ালের গায়ে, এই শয্যায়, বাহুযুগে।
কেউ নই আমি; বিস্ফোরণ নিয়ে উদ্বিগ্ন নই।
আমি আমার নাম আর গায়ের আচ্ছাদন দিয়েছি ওই নার্সদের কাছে
শরীর দিয়েছি সার্জনদের আর অবশকারীর হাতে ইতিহাস।

ওরা আমার মাথাটাকে ন্যস্ত করেছে বালিশ-কাঁথার মাঝে
যেন দুই সাদা পল্লবের ফাঁকে একটি চোখ; বন্ধ হবে না কোনোদিন।
ওরে মূর্খ! এ যে সবকিছু নিয়ে যায় অন্দরে।
সেবিকারা চলে যায় সারে-সারে, ক্ষতি নেই তাতে,
তারা চলে যায় যেন সাদা টুপি পরে শঙ্খচিল-দল ডাঙায় উড়ে যায়,
নানা কাজ করে নিপুণ হাতে তারা, একজন হুবহু অন্যের মতো,
ফলে বলা অসম্ভব তারা কত জন মোট।

আমার শরীর যেন কোনো নুড়ি, জলের মত তারা খেলে তাকে নিয়ে
এমন যত্নে খেলে, নুড়িগুলো উপচে যায়, মসৃণ করে তারা মেজে
বিবশ করে ওরা, ঘুম পাড়ায় আমায়, চকচকে সুচগুলো আনে।

নিজেকে এখন আমি হারিয়েছি, বাক্স-পেটরা অসহ্য —
আমার পালিশ করা লেদারবাক্স ঔষধের কালো ডিবে যেন,
পারিবারিক ছবিতে হাস্যোজ্জ্বল আমার স্বামী-সন্তান;
তাদের হাসি মুদ্রিত হয় আমার ত্বকে, ছোট-ছোট হাসির হুক।

... ...

প্রথমত, টিউলিপগুলো খুব বেশি লাল, ওরা আমায় বিক্ষত করে।
এমনকি উপহারের কাগজের মধ্য থেকেও আমি ওদের নিঃশ্বাস নিতে শুনি
খুব ধীরে, সাদা তোয়ালের ভেতর ছোট্ট, কিম্ভূত সদ্যোজাত শিশুর মতো।
ওদের লালিমা আমার ক্ষতের সাথে কথা কয়, সঙ্গ দেয়।
ওরা বেশ চতুর, তাদের ভাসতে ইচ্ছে হলে, আমাকে ডুবিয়ে দেয়
বিমর্ষ করছে আমায় হঠাৎ জিহ্বা আর শরীরের রঙ দিয়ে
এক ডজন লাল মালা যেন জড়িয়ে ধরে আমার গলা।

... ...

দেয়ালগুলোও উষ্ণতা বিলায় তাদের।
টিউলিপগুলো বুনো জন্তুর মতো বাধা হতে পারে তাতে;
আফ্রিকার বিখ্যাত বিড়ালের মতো যেন মুখ ব্যাদান করছে তারা
আমি আমার হৃৎপিণ্ড নিয়ে আতঙ্কিত: এটা একবার খোলে, একবার বোজে
এর লাল প্রস্ফুটিত বাটি আমার একান্ত ভালোবাসার অধীন নয়।
যে জল আমি পান করতে যাই, তাই উত্তপ্ত আর নোনা, সমুদ্রের মতো,
এবং তা আসে স্বাস্থ্য ও সুস্থতার মতো কোনো দূরের দেশ থেকে।

(Sylvia, 1965: 10-12)

সাত পঙ্‌ক্তি নিয়ে নয় স্তবকের কবিতাটি মুক্তছন্দে লেখা অথচ অন্তর্নিহিত ছন্দ অননুভূত নয়। এক পঙ্‌ক্তির লাইন কেটে অন্য পঙ্‌ক্তিতে জুড়ে দেয়ার উল্লম্ফন খেলাও চলেছে এখানে। এমন হাসপাতাল-দৃশ্য বিশ্বকবিতায় দুর্লভ। গাঙচিলের সারির মতো নার্সদের চলাফেরার চিত্রকল্পটি অনবদ্য। 'টিউলিপগুলো' কবিতায় রক্তিম ফুলগুলো নিঃশ্বাস নেয়, কথা বলে, জিহ্বা বের করে কবিকে উত্যক্ত করে, এমনকি মুখ ব্যাদান করে তেড়ে আসে। সিলভিয়ার কবিতার চিত্রকল্প প্রবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। সিলভিয়া তাঁর কবিতার যে-কোনো ছবিকে অলীকবীক্ষণ বা ভ্রান্ত কোনো প্রত্যক্ষণের মধ্য দিয়ে একটি অতিবাস্তব পর্যায়ে উত্তীর্ণ করেন। বাস্তব থেকে অলীকে গতায়াত এবং এ দুই বিপরীতের মধ্যে এক অনপনেয় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সিলভিয়ার কবিতার জাদু। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে টিউলিপের লালিমার প্রতি কবির আকর্ষণ-বিকর্ষণের দ্বন্দ্ব আমাদের জিজ্ঞাসু করে। টিউলিপগুলো তাঁর ক্ষতের সাথে কথা বলে, টিউলিপের উজ্জ্বল রঙে কবি উদ্দীপিত, কিন্তু তারা কি তাঁর শরীরিক ও মানসিক ক্ষতের শুশ্রূষা করতে পারে? বরং তারা তাঁর শরীর থেকে অম্লজান নিংড়ে নেয়, তাঁকে ক্রেংকারে ডুবিয়ে দেয়, তেড়ে আসে আফ্রিকার বিড়ালের মতো। প্রকৃতপক্ষে, যে ক্ষত কবির মনে, তার কোনো প্রতিকার নেই। এ শূন্যতাই তিক্ত করে তোলে কবির পরিপার্শ্বকে এবং আমাদের বৈষ্ণব কবি কিংবা ইউরোপের প্রাচীন কবিদের মতোই তৃষ্ণার সর্বস্বতা নিয়ে সিলভিয়া

বলেন, 'যে জল আমি পান করতে যাই, তাই উত্তপ্ত আর নোনা, সমুদ্রের মতো'। এই সর্বময় বিষাদ সিলভিয়ার কবিতার অদৃশ্য ও স্পর্শাতীত ব্যঞ্জনা, যা পাঠককে বিমর্ষ এক আনন্দ এনে দেয় আর তাঁর কবিতাকে সার্থক প্রতিপন্ন করে।

মনোবীক্ষণিক জটিলতা, দৃশ্য ও শ্রুতির অধ্যাস সিলভিয়ার কবিতাকে শৈল্পিক করে তোলে। অনেকক্ষেত্রে মানসিক বৈপরীত্যের সাথে এক ধরনের বসবাস ছিল তাঁর বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাঁর বাবার মৃত্যু ও মনের মধ্যে তাঁর চিরদিন বেঁচে থাকা, স্বামীর জীবন্ত প্রমূর্তির মধ্যে এরকম বাবার সনাতন মূর্তিকে প্রতিস্থাপন করা, মায়ের প্রতি তাঁর অকারণ ক্ষোভ এবং সীমাহীন ভালোবাসার মিশ্র প্রতিক্রিয়া; এমনকি জুলাইয়ের পপিগুলো কিংবা লাল টিউলিপগুলোর প্রতি তাঁর আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভাষা এ সবই তাঁর মানসিক বৈপরীত্যপ্রিয়তাকে নির্দেশ করে এবং এসব অনুষঙ্গে হুবহু এই মনস্তাত্ত্বিক দ্বৈধ প্রকাশ সিলভিয়া ব্যতীত অন্য কারো জানা থাকতে পারে না। সিলভিয়া তাঁর এ ব্যতিক্রমী মনোজগৎকে যখন আরো কোনো প্রতীক বা চিত্রকল্পের সমরূপ করে তোলেন, তখন এক অসাধারণ ব্যাসকূটে তা শৈল্পিক হয়ে ওঠে এবং সিলভিয়ার কবিতাকে একান্ত সিলভিয়াসুলভ মনে হয়। সিলভিয়ার ব্যক্তিগত জীবনের আখ্যান না জানা থাকলেও তখন তাঁর কবিতার রসাস্বাদন অসম্পূর্ণ থাকে না।

৬.

সিলভিয়া প্লাথের কবিতার স্বীকারোক্তি-প্রবণতা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তাঁর কবিতাকে অনায়াসে 'কনফেশনাল' বলে সরলীকরণ করা যায় না। তিনি নিজেই তা চাননি। সিলভিয়া মনে করতেন, কবির মানসিক অভিজ্ঞতা যতই উত্তুঙ্গ হোক, যতই কঠিন ও অসহনীয় হোক, তাকে আয়নার মতো সরাসরি প্রতিফলিত না করে বরং কবির উচিত তার সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত ও নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ ঘটানো (Sylvia, 1970: 64)। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সিলভিয়ার কবিতাকে মাঝে-মাঝে এক ধরনের প্রত্যক্ষতা দেয় কিন্তু অব্যবহিত পরেই হয়তো কোনো নৈর্ব্যক্তিকতায় তা নতুন মাত্রা লাভ করে। তিনি তাঁর মনের যন্ত্রণার সমান্তর কোনো দৃশ্য, চিত্রকল্প, প্রতীক বা বহিরাশ্রয় খুঁজে নেন। এ কারণেই সিলভিয়ার বহু কবিতাই বহুস্তরিক, জটিল এবং কখনো কখনো তা সর্বজনীনও বটে।

এরিয়েলের চিত্রকল্পগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিলভিয়ার সহজাত স্ফূর্তি থেকে জন্ম নেয়া। ছোট্ট কোনো ফুল, কিংবা কেটে যাওয়া রক্তাক্ত আঙুল কিংবা জীবনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। হঠাৎ কোনো দুরন্বয়ী ইতিহাস বা চিত্র, বা কোনো প্রসঙ্গের সাথে মেলান সেই দৃশ্যটি তারপর ঘনীভূত করে তোলেন কোনো আততি, ভাব বা অনুভাব। 'কাটা' (cut) কবিতায়, নিজের কাটা আঙুলের রক্ত-ঝরা দেখে তাঁর মনে হয় রক্তাক্ত আঙুলটি যেন কোনো ছোট্ট সন্ত, যার খুলিটা এইমাত্র কেটে নিয়েছে বর্বর রেডইন্ডিয়ানের দল অথবা রক্তধারায় তিনি দেখতে পান লক্ষ লক্ষ লাল সেনাদলের

সাজোয়া উৎসব (Sylvia, 1965:13)। সিলভিয়ার 'জন্মদিনের উপহার' (A Birthday Present) কবিতায় আকাশ দুর্বিষহভাবে বিষাক্ত। শুকনো তুলোর মতো আকাশ আর কার্বনমনোক্সাইড তার মেঘ-সেনাদল (Sylvia, 1965:43)। একাধিকবার কবির আকাশ নিঃসরণ করে কার্বনমনোক্সাইড। 'অক্টোবরের পপিগুলো' কবিতায়:

একটা আকাশ
মৃদুভাবে পিদিম-শিখার মতো
পোড়াচ্ছে কার্বনমনোক্সাইড
(Sylvia, 1965:19)

সিলভিয়ার কবিতায় স্নায়ুগুলো বিস্ফারিত হয় গাছপালার মতো, উড়ে বেড়ানো শিশিরগুলো হয় আত্মঘাতী, মধ্যবাতাসে ঘুরপাক খাওয়া কবির জীবন উপমিত হয় থমকে থাকা একটি ট্রেনের নিজেকে টেনে নিয়ে চলার চিত্রে এবং ট্রেনটিও আহত পশুর মতো কোঁকায় ('হচ্ছি তিন', 'Getting Three') (Sylvia, 1965: 37)। সিলভিয়ার কবিতার শব্দ-ভাষা যে প্রায়ই মূর্ত-বিমূর্ততায় মেশানো, তার দৃষ্টান্ত 'এলম' কবিতার নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলো:

ভালোবাসা একটা ছায়া
যতই তুমি কাঁদো আর বাধ সাধো তাকে
শোনো: ওই তার খুরধ্বনি: তা অন্তর্হিত
কোনো তুরঙ্গের মতো।

সারা রাত ধরে আমিও ধাই তেমন
নির্বিচারে
যতক্ষণ না তোমার মাথা হয় পাথর, বালিশ হয়
ঘাসের কুশন
প্রতিধ্বনি হয় প্রতিধ্বনি।

অথবা, আমি কি এনে দেব তোমায়
বিষের শব্দ?
বৃষ্টি হচ্ছে এখন, এই ব্যাপ্ত নিস্তব্ধতা
এবং এই তো তার ফল: টিন-সাদা, যেন
আর্সেনিক।

... ...
আমি ভয় পাই এই অন্ধকার বস্তুকে
ঘুমিয়ে থাকে যা আমারই মধ্যে;
সারাদিন আমি টের পাই এর নরম, পেলব নড়াচড়া
এর তামসতপ।

(Sylvia, 1965: 15)

উদ্ধৃতিতে 'ভালোবাসা একটি ছায়া' এই প্রত্যক্ষ সংজ্ঞার পর খুরধ্বনি তুলে জীবন থেকে তার দূরে মিলিয়ে যাওয়া একটি গতিশীল শ্রুতিচিত্রকল্প। আবার একই ক্ষুরের শব্দ নির্ঘুম কবির মস্তিষ্কে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। 'আমি কি এনে দেব তোমায়/ বিষের শব্দ' পঙ্‌ক্তিটি অদৃশ্যপূর্ব। বিষের বর্ণ নয়, গন্ধ নয়; 'বিষের শব্দে' তিনি সিম্বলিক কবিদের মতো এক ইন্দ্রিয়ের উপর আরেক ইন্দ্রিয়পাতের মাধ্যমে 'সিনাস্থেশিয়া'র প্রয়োগ ঘটান। তারপর আবারো নিস্তব্ধতায় বৃষ্টির শব্দ পাঠকের শ্রুতিকে জাগায় আর ভালোবাসার ফল গণ্য হয় টিন-সাদা আর্সেনিকের মতো। উদ্ধৃত পরবর্তী স্তবকে কবি নিজের মধ্যেই এক রোমশ ও বিধ্বংসী সত্তার উপস্থিতি টের পান। শেষ স্তবকটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কবির অন্তস্থ অন্ধকার সত্তাটির কোনো প্রতিতুলনা নেই, কিন্তু তা পাশবিক ও ক্রমহন্তারক এক সত্তায় মূর্ত-অমূর্তের মাঝামাঝি মিশে থাকে। সে সত্তা কবি অনুভব করেন কিন্তু ব্যক্ত করতে পারেন না, যা তাকে কুড়ে-কুড়ে খায়— 'That kill, that kill, that kill'।

মুক্তছন্দে লেখা *এরিয়েলের* কবিতাগুলোতে ধ্বনি-অনুপ্রাসের প্রয়োগে সিলভিয়া এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে, যা কিছু বলেন, তাই কবিতা হয়ে যায়। সবচেয়ে লক্ষণীয় তাঁর কবিতার বদ্ধাক্ষরের ধ্বনিঅনুপ্রাস। কানের ভেতর খট-খট করে বাজে অথচ ক্রমাগত সেই খটমটে ধ্বনির পুনরাবৃত্তি একটা জোর প্রতিরোধের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে সিলভিয়ার কবিতায়। ভাষাগত ভিন্নতার কারণে অনুবাদকের পক্ষে বদ্ধাক্ষরের সে সামঞ্জস্য দৃশ্য-শ্রুতিময় করে তোলা দুরূহ বলে সিলভিয়ার ভাষাতেই উদ্ধৃত হলো:

> Pure? What dose it mean?
> The tongues of hell
> Are dull, dull as the tripple
>
> Tongues of dull, fat Cerberus
> Who wheezes at the gate. Incapable
> Of licking clean
> (Sylvia, 1965: 53)

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিগুলোতে সিলভিয়া যে প্রবল বিদ্রূপময় শব্দ-ধ্বনিতে 'বিশুদ্ধতা'কে উপর্যুপরি পরিহাস করেন, তা সম্ভব হয়েছে তাঁর বদ্ধাক্ষরীয় অনুপ্রাস প্রয়োগের দুর্দান্ত উদ্যমে— dull-hell, tongues-tripple প্রভৃতি শব্দের পুনরাবৃত্তিতে। বদ্ধাক্ষরকে আয়ুধের মতো প্রয়োগ করে কবিতায় এক ভিন্নরকম ধ্বনি-প্রক্ষেপণ সৃষ্টি করেন, যার দৃষ্টান্ত আধুনিক কবিতায় দুর্লভ। যে-কোনো কবির চেয়ে সিলভিয়ার ধ্বনি-সাধনা তীব্রভাবে পৃথক এবং মিথ-চিত্রকল্প-শব্দ-ধ্বনি প্রভৃতি মিলে সিলভিয়ার দশপ্রহরণ যখন সমন্বিত হয়, তখন তাঁর কবিতা প্রস্তুত হয় যুযুৎসার জন্য।

সিলভিয়া প্লাথ বিশ্বকবিতায় দুঃসহ বেদনার এক রুদ্র প্রতিমূর্তি। কিন্তু তাঁর কবিতা কেবল অবমানিত নারীর আত্মকথন নয়। ব্যক্তিগত কবিতায় সংবাদ পরিবেশনের ধরনে কোনো রাখঢাক ছাড়াই যেমন দিনানুদৈনিক স্বীকারোক্তি এঁকে চলা হয়, সিলভিয়ার *এরিয়েল* তার মতো নয়। *এরিয়েল* কাব্যের কবিতাগুলো প্রত্যক্ষ হয়েও প্রত্যক্ষের অতীত; ব্যক্তিক হয়েও সমদর্শী। বারবার নিজ অস্তিত্বের নির্মোক বদলে জীবনের শীতার্ত শেষ বছরটিতে সিলভিয়া হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি অস্তিত্বশীল— সন্ধান পেয়েছিলেন কবিতায় তাঁর কাঙ্ক্ষিত রীতি, শব্দ-ভাষা, প্রতীক ও ছন্দ-ধ্বনির। তাঁর কবিতা তাই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের বিশুদ্ধ প্রকাশ। কবিতা সিলভিয়ার কাছে কবিতামাত্র নয়, বরং অস্তিত্বযুদ্ধের অপর নাম। *এরিয়েল* জীবনবাজিতে জেতা তাঁর মৃত্যুহীন কথামালা।

টীকা

১. এখানে ৪টি কাব্যের প্রথম ও শেষটি যথাক্রমে ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথমটি প্রকাশকালের দিক থেকে প্রথম এবং শেষটি রচনাকালের দিক থেকে শেষ। মাঝের দুটি ১৯৭১ সালে বের হলেও এ দুটির কবিতাসমূহ রচিত হয় শেষ কাব্যটি রচনার পূর্বে। সে-কারণেই এ ধরনের ক্রমে বিন্যাস করা হয়েছে।

২. 'গ্রিক অব নেসেসিটি' বা অ্যানাঙ্কে (Ananke) প্রাচীন গ্রিকধর্মে অনিবার্যতা, বশ্যতা ও প্রয়োজনের দেবী। সেই অদম্য নারীর হাতে থাকে সুতা কাটার টাকু। সংসারে নারীর শক্তিময় ও কর্মনিপুণ সত্তার প্রতীক এ দেবী।

৩. ফ্রিস্কো-সিল: সানফ্রান্সিসকোর বিরাটকায় 'সী-লায়ন'।

গ্রন্থপঞ্জি

A. Alvarez, 1970. 'Sylvia Plath', *The art of Sylvia Plath: A Simposium*, edited by Charles Newman, Indiana University Press, London, Page: 56-68

Ames Lois, 1971. 'Biographical note to *The Bell Jar*', by Sylvia Plath, Harper & Row Publishers, New York

Ann Stevenson, 1989. *Bitter Fame: A Life of Sylvia Plath*, Houghton Mifflin Company, Boston

Judith Kroll, 1978. *Chapters In a Mythology: The Poetry Of Sylvia Plath*, Harper & Row Publishers, New York

Sylvia Plath, 1965. *Ariel*, Harper Perennial Publisers , New York

Sylvia Plath, 1992. *Letters Home*, Harper Perennial Publisers, New York

Sylvia Plath, 1978. *Chapters In a Mythology: The Poetry Of Sylvia Plath*, Judith Kroll Harper & Row Publishers, New York

Sylvia Plath, 1970. *The art of Sylvia Plath: A Simposium*, edited by Charles Newman, Indiana University Press, London

Ted Huges, 1985. "Sylvia Plath and her journals'', *Ariel Ascending: Writings about Sylvia Plath*, edited by Paul Alexander, Harper & Row Publishers, New York, Page: 152-164

Ted Huges, 1999. *Birthday Letters*, ISIS Publishing LTD, U.K.